সিপিআই (এম) সিপিআই কংগ্রেস ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি পাল্টে দিতে পারে

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

পাঞ্জাবের রাজধানী চন্ডিগড় ও কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লিতে ভারতের দু'টি কমিউনিস্ট সংগঠন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) দু'টি কংগ্রেস কয়েক দিনের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হলো। ভারতের সব রাজ্যগুলো থেকে দলীয় প্রতিনিধি পর্যবেক্ষকরা যেমন, তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিরা এসেছিলেন এই কংগ্রেস দু'টিতে যোগ দিতে। এসব ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির মধ্যে যেমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীন, ভিয়েতনামা, কিউবা, উত্তর কোরিয়ার পার্টির প্রতিনিধিরা ছিলেন তেমনি ছিলেন প্যালেস্টাইনের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতিনিধিরা। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ল্যাতিন আমেরিকা এবং সার্ক দেশসমূহের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির প্রতিনিধিরা। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পাটি ও কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চ পর্যায়ের দু'টি প্রতিনিধিদল ঐ কংগ্রেস দু'টিতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। এই দুই পার্টির কংগ্রেস সে দেশের রাজনৈতিক মহলে যেমন, তেমনি এ দেশসহ বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ ঔৎসুকের সঞ্চার করেছিলো। এর কারণ এই প্রথমবারের মতো ভারতের বামপন্থীরা কেন্দ্রীয় সরকারে একটি নির্ধারক ভূমিকায় যেতে পেরেছে। এটি ঠিক যে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই-এর(এম)নেতৃত্বে বামফ্রন্ট আটাশ বছর ধরে সেই রাজ্য শাসন করছে। ত্রিপুরাতেও মাঝে এক টার্ম বাদে ঐ সিপিএম-এর (এম) নেতৃত্বেই রাজ্য সরকার পরিচালনা করছে বামপন্থীরা। ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট শাসিত রাজ্য বেয়ালাতেও সিপিআই-এর (এম) নেতৃত্বে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় যাওয়ার আশা করছে। কিন্তু সারা ভারত, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা সব সময় গৌণই থেকেছে। মাঝখানে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সময় সিপিআই (এম)-এর প্রধান নেতা কমরেড জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো। সিপিআই(এম) তাতে রাজি হয়নি। বাইরে থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন দিয়েছিলো। কিন্তু যুক্তফ্রন্টকে প্রধানত নির্ভর করতে হয়েছিল কংগ্রেসের সমর্থনের ওপর। কংগ্রেস ঐ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে তার পতন ঘটেছে। কিন্তু এবার কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন যে ইউপিএ সরকার গঠিত হয়েছে তা পুরোপুরি বামপন্থীদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল। বামপন্থীরা ইউপিএ-র অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির (Common Minimum Programme) ওপর সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তবে সরকার পরিচালনার বিভিন্ন নীতির ব্যাপারে তারা তাদের আপত্তির কথা তুলতে ভোলে না। তাদের এ ধরনের আপত্তির মুখে ইউপিএ সরকারকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পিছু হটে আসতে হয়েছে। সিপিআই (এম) সিপিআই-এর উভয় কংগ্রেস থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে তারা যদি তাদের নিজেদের প্রণীত অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে না চলে তবে তার বিরোধিতায় বামপন্থীরা ব্যাপক আন্দোলন করবে। পরিণতিতে সরকার থেকে তারা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হতে পারে। তবে তারা ইউপিএ সরকারকে পাঁচ বছরই ক্ষমতায় দেখতে চায়। বিজেপি নেতৃত্বাধীন বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় ফিরে আসুক এটা তারা একেবারেই চায় না।

ভারতের রাজনীতির বাস্তবতায় এই বিশেষ দিকটির কারণে এই দু'টি পার্টির কংগ্রেস কি সিদ্ধান্ত নেয় সে ব্যাপারে সবাই বিশেষ উৎসুক ছিল।

উভয় কংগ্রেসই স্পষ্টঃ করে দিয়েছে যে তারা সাম্প্রদায়িকতা ও উদারনীতি এই উভয় বিপদ রুখতে একযোগে লড়াই করবে। বাম আন্দোলনের আরো বিকাশই উভয় পার্টির লক্ষ্য। বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তোলার কাজটি পার্টির কাছে প্রধান। বামদের পাশে অন্যান্য শক্তিকেও সমবেত করতে চাচ্ছেন তারা। এদের নিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপির বাইরে যে তৃতীয় বিকল্প তৈরির চেষ্টা তারা করে আসছেন পার্টির শক্তি বাড়িয়েই তারা সেই কার্যকর বিকল্প গড়তে চান।

সিপিআই-এর (এম) পার্টি কংগ্রেসে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনো পরিবর্তন আসেনি। সিপিআই)-এর (এম) ক্ষেত্রে পার্টির একটি কংগ্রেস ছাড়া সকল কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড হরকিষাণ সিং সুরজিত সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আসা কমরেড প্রকাশ কায়াত। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা হরকিষাণ সিং, সুরজিত ও কমরেড জ্যোতি বসু পার্টিরটপলিব্যুরো থেকে অব্যাহতি চাইলেও তাদের সেখানে রেখে দেয়া হয়েছে।

সিপিআই-এর (এম) ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো একজন মহিলা কমরেড, কমরেড বৃন্দা কায়াত পার্টির পলিটব্যুরোতে এসেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতেও অনেক নতুন মুখের সংযোজন ঘটেছে।

ভারতের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস অতি পুরাতন। আদর্শবাদ ত্যাগ ও লড়াকু সংগ্রামের উদাহরণে ভরপুর। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতে স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে ভারতের কমিউনিস্টদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা রয়েছে। সিপিআই-এর (এম) কংগ্রেসে চারজন প্রবীণ কমরেডকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে কমরেড প্রকাশ কায়াত বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় জনতা পার্টি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী এ ধরনের কোনো নেতার নাম করতে পারে না। কমিউনিস্টরাই গৌরবের নামে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে পারে। স্বাধীন ভারতেও তারা শয়ে শয়ে প্রাণ দিয়েছেন, জেলে কাটিয়েছেন জনগণের মুক্তির লড়াই, সমাজ বদলের লড়াইকে এগিয়ে নিতে। সিপিআই (এম) কংগ্রেসে গৃহীত শোক প্রস্তাবে উল্লেখ করে

ভারতের লোকসভায় বামপন্থিরা এখন তৃতীয় শক্তি। এই অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগাতে চায় তারা। সে কথাই বারবার ব্যক্ত করা হয়েছে সিপিআই(এম) কংগ্রেসে। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারকে সমর্থনের বিষয়ে পার্টির মধ্যে নানা প্রশ্ন থাকলেও কেন্দ্রে একটি অসাম্প্রদায়িক সরকার টিকিয়ে রাখতে বিশেষ আগ্রহী তারা

যে, তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ কংগ্রেসের পর অষ্টাদশ কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে এক ত্রিপুরাতেই শহীদ হয়েছেন ২০২ জন পার্টি সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। পশ্চিমবঙ্গে এভাবে নিহতের সংখ্যা ১৭১ জন।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই বিশাল ঐতিহ্যের পর সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাদের অবস্থান যে গৌণ, কেবল পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ও কেরালার মধ্যে এখনো সীমাবদ্ধ সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিভক্তি। অভ্যন্তরীণ কৌশলের প্রশ্নসহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীন-মস্কোকেন্দ্রিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি ঘটায়। এর একটি অংশ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সংশোধনবাদী পক্ষ অনুসরণ করে বুর্জোয়া লেজুড়বৃত্তিতে লিপ্ত হয় এবং কংগ্রেসের সহযোগী হিসেবে তাদের বিভিন্ন অপকর্মের শরিক হিসেবে পরিচিত হয়। অন্যদিকে চীনপন্থার সমর্থক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সহসাই বামবিচ্যুতিতে আক্রান্ত হয়। তীব্র মতাদর্শগত ও প্রয়োগগত সংগ্রাম দিয়ে পার্টি নেতৃত্ব ঐ বিপর্যয়ের হাত থেকে পার্টিকে রক্ষা করে স্বাধীন নীতি অনুসারে নিজেদের সংগঠিত করতে ও এগিয়ে নিতে পারলেও বাম বিচ্যুতির ভ্রান্ত পথে পার্টির বহু কর্মীকে জীবন দিতে হয়। নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট এই ধারার অনুসারীরা নক্সালপন্থী বা নকশাল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। প্রথমদিকে তাদের বিপ্লবী বাগাড়ম্বরতায় অসংখ্য তরুণকে সেই পথে আকৃষ্ট করতে পারলেও ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং নিজেদের প্রাপ্ত মতবাদজনিত বড় ধরনের ভুলের কারণে এরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পরে নিজেরাই দ্বিধা-ত্রিধা-বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই ধারার অনুসারীরা কোথাও জনযুদ্ধ, কোথাও লালপতাকা নামে সশস্ত্র সংগ্রাম তথা ব্যক্তিহত্যা, নাশকতা প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকলেও অধিকাংশই এখন নির্বাচন ও সংসদীয় রাজনীতির পথে ফিরে এসেছে। বিহার ও ঝাড়খন্ডে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) রাজ্যসভায় ভালো আসনও পেয়েছে। তবে এই ধারার রাজনীতি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে ক্ষতি করে দিয়েছে তার ধকল এখনো পোহাতে হয়। বিশেষ করে হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলোতে পার্টির যেটুকু ঠিকানা ছিল তা রুদ্ধ হয়ে পড়ে এসব ঘটনার কারণে। অন্যদিকে দক্ষিণের রাজ্য অন্ধ্র ও কর্ণাটকে এর প্রভাব পড়েছিল। ভারতের দীক্ষণের রাজ্যগুলো ও পাঞ্জাবের স্বপচিতির লড়াইয়ে কমিউনিস্টরা পিছিয়ে পড়ে। এসব রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলো প্রধান হয়ে ওঠে। ফলে কমিউনিস্টদের ভারতীয় অবস্থান ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রসকে নিঃশর্ত সমর্থন কমিউনিস্ট আন্দোলনের ডাকসাইটে নেতাদের ইন্দিরার অনুসারীদের পরিণত করে। পক্ষান্তরে যারা ঐ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবিচল ছিলেন তারা তাদের নিজেদের রাজ্যের গন্ডির বাইরে বেরুতে পারলেন না।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে কংগ্রেস চন্ডীগড়ে হয়ে গেল তার উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাব-হরিয়ানার পায়ের নিচে কিছু মাটি পাওয়া। অন্যদিকে সিপিআই(এম) হিন্দি বলয়ে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি ও পার্টির বিস্তৃতি ঘটাবার জন্য এই প্রথমবারের মতো নয়াদিল্লিতে তাদের পার্টির কংগ্রেস করে। সিপিআই-এর (এম) এই কৌশল অবশ্য বিশেষ কাজে দিয়েছে। দিল্লিতে পার্টির দুর্বল অবস্থানের পরও জনসমর্থন পাওয়ার এ ধরনের একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠানে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। দিল্লির পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে গেইট মিটিং করেই তারা দশ লাখ টাকা চাঁদা তুলেছেন। আর অন্যান্য সংগ্রহ থেকে এসেছে বাকি চল্লিশ লাখ। কংগ্রেস প্রতিনিধিদের খাবারের ভাত ও রুটির জন্য চাল ও গম দিয়েছে পাঞ্জাবের পার্টি। কংগ্রেস শেষে দিল্লির রামলাল ময়দানে যে পঁচিশ হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছিল তারা এসেছে পার্শ্ববর্তী হিন্দি রাজ্যগুলো থেকে। এভাবেই গিন্দি বলয়ে পার্টির ভিত্তিকে প্রসারিত করতে চেয়েছে সিপিআই(এম)। তবে সব ক্ষেত্রেই তাদের জোর আন্দোলনে, গণসংগঠনের বিকাশে। নতুন প্রজন্মকে পার্টিতে অধিকহারে অন্তর্ভুক্ত করার কাজে। পার্টির মতাদর্শ, নৈতিকতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার মধ্যে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাস্তবতাকে বিবেচনায় নেয়ার দক্ষতায়।

ভারতের এই দু'টি কংগ্রেসেই সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের দ্বি-বিপদের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। পার্টির উদ্বোধন অধিবেশনে যেমন, তেমনি সমাপনী ভাষণে প্রধান নেতা কমরেড জ্যোতি বসু জোর দিয়েই বলেছেন যে, সরকার থেকে বিজেপি সরলেও মৌলবাদের বিপদ দূর হয়নি। অপরদিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস উদারনীতিবাদ থেকে দূরে সরে আসেনি। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তেমনি বিজেপি অনুসৃত আঞ্চলিকনীতি থেকেও দূরে থাকতে হবে। সরকারকে এমন রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে যাতে উন্নয়নের সুফল আম-জনতার কাছে পৌছায়। সিপিআই(এম) বাস্তবতার ভিত্তিতে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলেছে। বিদেশী বিনিয়োগের যে সোনার হরিণের কথা সাধারণত বলা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে জ্যোতি বসুর কথা- সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ হতে পারে। কিন্তু তা হতে হবে দেশের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের দিকে নজর রেখে এবং পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে অবশ্যই শক্তিশালী করার কথা তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেন।

সাম্রাজ্যবাদকে এতোটুকু ছাড় নয়- এই ছিল উভয় কংগ্রেসেরই কথা। সিপিআই(এম) কংগ্রেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতা নীতির বিরোধিতা করেছে তো বটেই, ইসরাইলের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা নীতি বাতিল চেয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে উভয় কংগ্রেসেই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ দাঁড়িয়েছে কাঠগড়ায়। অভিযোগ করা হয়েছে যে, ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আশ্রয় পাচ্ছে বাংলাদেশে যা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ন করছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করবে বলেও তারা উল্লেখ করেছে। অবশ্য বাংলাদেশের জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল অগ্রযাত্রার জন্য তাদের সুভাকাঙ্ক্ষারও কথা বলেছেন তারা। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার বাম ও প্রগতিশীলদের ঐক্যের প্রসঙ্গও উঠে আসে। কংগ্রেসে ওয়ার্কার্স পার্টির তরফ থেকে দেয়া বক্তব্যে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলায় দক্ষিণ এশিয়ার বামপন্থিদের বৈঠক অনুষ্ঠান ও একটি অভিন্ন সীমারেখা নির্ধারণের আহ্বান জানানো হয়। সিপিবির পক্ষ থেকেও একই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। শ্রীলঙ্কার পাকিস্তান এবং নেপালের কমিউন্টি পার্টিও ঐ কথার প্রতিধ্বনি করে। এসব পার্টি সূত্র থেকে জানা গেছে, শীঘ্রই এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হতে পারে। আর সেটা নেয়া হলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর বামপন্থি আন্দোলন আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে ধারণা।

ভারতের লোকসভায় বামপন্থিরা এখন তৃতীয় শক্তি। এই অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগাতে চায় তারা। সে কথাই বারবার ব্যক্ত করা হয়েছে সিপিআই(এম) কংগ্রেসে। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারকে সমর্থনের বিষয়ে পার্টির মধ্যে নানা প্রশ্ন থাকলেও কেন্দ্রে একটি অসাম্প্রদায়িক সরকার টিকিয়ে রাখতে বিশেষ আগ্রহী তারা। এরই পাশাপাশি নয়া উদারনীতিবাদী আর্থিক নীতিকে প্রতি পদে বাধা দিতেও তারা সদা প্রস্তুতই কেবল নয়, লড়াইতেও এগিয়ে। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে বামপন্থিদের এই অবস্থান নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। বাধা দুস্তর, কিন্তু তা অতিক্রম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষিত হয়েছে। তাদের প্রদর্শিত পথ কেবল উপমহাদেশেই নয়, দক্ষিণ এশিয়াকেও পাল্টে দেবার সম্ভাবনা। সেটা কী রূপ নেবে আগামী দিনগুলোই সে কথা বলবে।